দর্শনে মুসলমান

সম্পাদনা : মুহম্মদ বরকতুল্লাহ

দর্শনে মুসলমান

সম্পাদনা : মুহম্মদ বরকতুল্লাহ

প্র কা শ ন

সূচিপত্র

ভূমিকা	৭
আল-কিন্দী — সাইয়েদ আবদুল হাই	১৩
আল ফারাবী — মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্	২৯
ইবনে সিনা — মুহম্মদ বরকতুল্লাহ	৫১
আল-গাজালী — অধ্যক্ষ শইখ শরফুদ্দীন	৭৭
ইমাম রাযী — শাইখ আবদুর রাহী	১০৩
ইবনে খলদুন — সাইদুর রহমান	১৩৭
হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী — এ, এফ, এম, আবদুল আযীয	১৫৭
শাহ অলীউল্লাহ দেহলভী — ডক্টর মুহাম্মদ এছহাক	১৯২

ভূমিকা

অন্ধকার আরবে ইসলামের অরুণোদয় দীর্ঘ কাল আরব জাতিকে সম্মোহিত রেখেছিল। মহাগ্রন্থ কুরআন যে অমৃত বাণী বয়ে এনেছিল তারই আলোচনা ও অনুধাবন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জীবনের অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তারই ভিতর তারা খুঁজে পেত জীবন সমস্যা সমাধানের উপযোগী যাবতীয় নির্দেশ। আত্মা কি, তার স্রষ্টা কে, স্রষ্টার সহিত মানবাত্মার কি সম্পর্ক, আল্লার প্রতি মানুষের এবং মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি, ইহলোক, পরলোক, কর্মফল, নিয়তি পাপ-পুণ্য, ইত্যাদি সকল প্রশ্নের সম্পর্কেই কুরআনের নির্দেশ সুস্পষ্ট। এই কুরআনকে পাথেয় করে আরবের বীর সন্তানগণ যখন উমাইয়া খলিফাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের পর দেশ জয় করে চলছিল, তখন তাদেরই কতকলোক আধ্যাত্মিকতা ও গভীরতর তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধানে আল কুরআনের অতলগর্ভে অন্বেষণরত ছিল। রাজধানী হতে দূরে অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে তাদের কতকগুলি অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এগুলির মুকুটমণি ছিল বসরার প্রখ্যাত তাপস হাসান বসরীর আশ্রম। আদর্শ মুসলিমরূপে জীবনযাপন করতে হলে একজন মুসলমানের কি কি করণীয়, সেই সব আলোচনার সাথে এই আশ্রমে আলোচনা হত সৃষ্টিরহস্য, স্রষ্টার স্বরূপ, আল্লার গুণাবলী, পাপ-পূণ্য ও মঙ্গল-অমঙ্গলের উৎস, ঐশীবাণীর চিরন্তনত্ব ইত্যাদি দর্শনের অনেক জটিল প্রশ্ন। এ জাতীয় অনুশীলন কেন্দ্রগুলি প্রেরণা লাভ করতো যে

মহাউৎস হতে তা ছিল মদীনায় প্রতিষ্ঠিত। মহানবীর একজন বংশধর এবং ইমাম হুসাইনের প্রপৌত্র প্রখ্যাত ইমাম যাফর আস্ সাদিক ছিলেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম ও শাস্ত্রবিদ। প্রতি জুমার পর কুরআন, হাদীছ ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে শোনার জন্য শুধু মদীনার লোক নয় আরবের দূর দূরান্তর হতেও বহুলোক সেখানে জমায়েত হত। তাঁর বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য ছিল এই, তিনি দার্শনিক তত্ত্বসমূহের শুধু প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পরিবেশন করতেন না, লোকদিগকে প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে এবং অনুধাবন করতে উৎসাহিত করতেন। আল-কুরআনের নির্দেশ ছিল তাই। এইভাবে আরব পণ্ডিতদের ভিতর অনুসন্ধিৎসা ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করার স্পৃহা জাগ্রত হয়। প্রসিদ্ধ ধর্মীয় নেতা ও শাস্ত্রবিদ ইমাম-আবু হানিফা ও ইমাম আবদুল মালেকের মত লোক ও ইমাম জাফরের শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এইভাবে হি. দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগেই খ্রিষ্টীয় ৮ম শতকে আরবে এক সুষ্ঠু ধর্মীয় দর্শন (Theology) সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে।

ইতিমধ্যে আরব জাতি পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অনেকদূর এগিয়ে যায়। আব্বাসীয় খলিফাদের শাসন আমলের প্রথম একশত বৎসর ছিল আরবজাতির জ্ঞানচর্চার স্বর্ণযুগ। এই যুগের প্রারম্ভে আরবে একদল তরুণ মুসলিমের আবির্ভাব ঘটে। যাদের দাবী ছিল, চিন্তার ক্ষেত্রে নিরঙ্কুস স্বাধীনতা যা যুক্তি-নির্ভর নয় তেমন কিছুই তারা মানতে রাজী ছিলনা। ইউরোপীয় নব্য দর্শনের জন্মদাতা বেকন বা দেকার্তের তখনও জন্ম হয়নি। সেই প্রাচীন যুগে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে আরবের এই তরুণ দার্শনিকদল মানুষের সাধারণ জ্ঞানগোচর সকল তথ্যের সহিত, ধর্মীয় অলঙ্ঘ্য শাস্ত্রাবলীসমূহের যুক্তিতর্কের কষ্টিপাথরে যাচাই শুরু করেন।

এরা ইসলামের মূলসূত্র তৌহিদেরও সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণে রত হন এবং আল্লার একত্ব অক্ষুণ্ণ রক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তার উপর মনুষ্য

আরোপিত গুণাবলীর সত্তা অস্বীকার করে বলেন। এইভাবে ক্রমে তারা বহু বিষয়ে শাস্ত্রাবলীর অমোঘতা অস্বীকার করেন। তার ফলে তদানিন্তন মুসলিম জাহানে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই তরুণ দলকে সে কালে 'মুতাজিলা' (দলত্যাগী) বলা হত। আশ্চর্য এই, মুতাজিলা দর্শনের আদিগুরু ওয়াসীল বিন আতা এককালে বসরার প্রসিদ্ধ হাসান বসরীরই শিষ্য ছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে, একদা অদৃষ্ট ও পুরস্কারের ব্যাখ্যা নিয়ে গুরুর সহিত তাঁর মতানৈক্য ঘটে এবং তার ফলে তিনি হাসান বসরীরই শিষ্য-সমাজ হতে বহিষ্কৃত হন। কিন্তু ওয়াসীলের কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান ছিল সুগভীর, তার বুদ্ধিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। শীঘ্রই তাঁর শিষ্য জুটলো অনেক। তারা তাঁকে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নতুন জ্ঞানকেন্দ্র স্থাপন করলো।

মুতাজিলা দর্শন এককালে নিষ্ঠাবান আলিম সমাজকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল কিন্তু আসলে মুতাজিলা দার্শনিকগণ নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন চরম একেশ্বরবাদী। অদৃষ্ট ও পুরস্কারের বিতর্কে ওয়াসীল বলেছিলেন, আল্লাহ মানুষের সকল কর্মের নিয়ামক একথা স্বীকার করা চলেনা, কেননা তিনি পাপকর্মের নিয়ামক হলে পাপীকে দণ্ডদান তাঁর ন্যায় বিচারের খেলাপ হয়ে দাঁড়ায়। তৌহিদ অর্থাৎ আল্লার একত্ব স্বীকার এই সূত্র হতে মুতাজিলা দার্শনিকগণ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুরই চিরন্তনত্ব স্বীকার করতেন না। লক্ষ্যনীয় যে শাস্ত্রপন্থী দর্শন এবং মুতাজিলা দর্শন, উভয়ই ছিল শাস্ত্রকেন্দ্রীক। কিন্তু ইতিমধ্যে আরবজাতির ভিতর পদাথবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভেষজশাস্ত্র, গণিত ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়। খলিফা আলমামুনের রাজসভায় পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যজাতির পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশ ছিল। এই পরিস্থিতিতে আরবজাতি গ্রীকদের বিজ্ঞান ও দর্শনের সহিত পরিচিত হয়। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল অ্যারিস্টটলের পদার্থ বিজ্ঞান, লজিক মেটাফিজিকস।

শাস্ত্রানুশীলন ক্লান্ত, আরব ও পারস্য পণ্ডিতগণ বুভুক্ষের ন্যায় এই নতুন জ্ঞানের পিযূষধারা পান করতে থাকেন। তাঁদের অনেকে অ্যারিস্টটলের মূল গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের আকাঙ্খার গ্রীকভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন এবং প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত ভাষ্য প্রণয়ন করেন যেগুলির পাণ্ডিত্য পাশ্চাত্য জগতকে বিস্মিত করেছিল। গ্রীক দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ইসলামি দর্শনের পটভূমিতে ইবনে সিনা এক পূর্ণাঙ্গ দর্শন প্রণয়ন করেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় জগতে তাঁর দর্শনের স্বকীয়তা ও যৌক্তিকতা একবাক্যে স্বীকৃত হয়েছিল। মুসলমান জাতির কোনো দর্শন ছিল না এ অপবাদ যে অমূলক, তা এই সকল যুগমান্য মনীষী অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত করেছেন।

বিজ্ঞানপন্থী মুসলিম দার্শনিকদের ভিতর আলকিনদী, আল-ফারাবী, আর-রাযী এবং ইবনে সিনার জীবন ও দার্শনিক অবদান এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। সেই সাথে আলোচিত হয়েছে প্রসিদ্ধ সুফি দার্শনিক ইমাম গাজালীর জীবনকথা ও দর্শন। ই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের বলে মুতাজিলা দর্শনের ভ্রমত্রুটি প্রদর্শন করেন এবং বিজ্ঞানপন্থী জড়বাদী মুসলিম দার্শনিকদের চক্ষু উন্মীলন করে দেন এই প্রতিপন্ন করে যে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের পরিধিই মনুষ্যজ্ঞানের শেষ সীমা নয়, মানুষের পঞ্চ বাহ্য ইন্দ্রিয় ছাড়া আরো একটি ইন্দ্রিয় রয়েছে যাকে অন্তর ইন্দ্রিয় (Intuition) বলা যেতে পারে যার সাহায্যে মানুষ অতিন্দ্রীয় জ্ঞানের অধিকারী হয়। গাজালী সুফি-দার্শনিকদের তত্ত্বজ্ঞান আহরণের দিকেই ইঙ্গিত করেন। বস্তুত, এইভাবে তিনি সুফি দর্শন ও শাস্ত্রভিত্তিক ইসলামি দর্শনের ভিতর সেতুবন্ধন রচনা করে মুসলিম জাহানের মানসিকতার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ঐক্য আনয়ন করেন।

এশিয়া ভূখণ্ডে ইবনে সিনার পর বিজ্ঞান পন্থী দর্শনের আর অধিক অগ্রগতি হয় নাই, কিন্তু স্পেনীয় মুসলিম দার্শনিকগণ এরপরও

দুইশত বৎসর উক্ত দার্শনিকতার জের টেনে চলেন। এদের ভিতর ইবনে বাজা (১১৩৪ খ্রি.) ইবনে তোফায়েল (১১০০-১১৮৪ খ্রি.) ইবনে বাজা রুশদ (১১২৬-১১৯৯ খ্রি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইবনে রুশদ নবধর্মের সার অবলম্বনে এক সার্বজনীন ধর্মের পরিকল্পনায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর মতে জগতের সকল ধর্মেরই সত্য এক, বিবাদ শুধু খোলস অর্থাৎ আচার-পদ্ধতি নিয়ে। তাঁর এই চরম উদার মতের জন্য তিনি স্পেনের সুলতান কর্তৃক নির্বাসিত হয়েছিলেন। দর্শন ক্ষেত্রে তাঁর উক্ত পরিকল্পনা যে মনুষ্য চিন্তার চরম উৎকর্ষের পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নেই। ইউরোপে তাঁর মত 'এভিরোইডান' নামে পরিচিত। দুঃখের বিষয় উপযুক্ত গ্রন্থাদির অভাববশত: এই যুগান্তকারী মুসলিম দার্শনিকের জীবনকথা ও দর্শনের আলোচনা করা এ গ্রন্থে সম্ভবপর হয়নি। এই পুস্তকে মুসলিম দার্শনিক ছাড়া কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তানায়কের জীবন ও কার্যকলাপ আলোচিত হয়েছে। এঁরা হচ্ছেন, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রচিত মানব ইতিহাসের জন্মদাতা ইবনে খলদুন, পাক-ভারতে মুঘলযুগের ধর্মীয় বিপ্লব হতে মুসলমানদের রক্ষাকারী হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী, মুসলিম জাতির পতন যুগে পাক-ভারতের নির্যাতিত মুসলিমদের ভিতর আত্মসম্বিৎ জাগ্রতকারী শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী। বিভিন্ন যুগে জাতীয় সঙ্কটে এই সকল মনীষীর চিন্তাধারা, কর্ম ও জীবনাদর্শ মুসলিম জাতির ইতিহাসের মোড় ফিরিয়েছে। পাকিস্তান এক নবজীবনের উন্মেষ পথে পদক্ষেপ করেছে। এই যুগসন্ধিক্ষণে এই গ্রন্থ যদি তরুণ পথ-চারীদের যাত্রাপথে কিঞ্চিৎ প্রেরণা যোগাতে সমর্থ হয়, তবেই এই গ্রন্থের প্রকাশনা সার্থক বিবেচিত হবে।

মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্

আল-কিন্দী

(৮০১ খ্রি. — ৮৭৩ খ্রি.)

— সাইয়েদ আবদুল হাই

দুনিয়ার ইতিহাসে বিদ্যা-অর্জন, জ্ঞান-আহরণ ও সত্য-সন্ধানের জন্য যে সব মনীষী অমর হয়ে আছেন, আল-কিন্দী তাঁদের মধ্যে একজন। অনেক মনীষীর মতে খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দুনিয়ায় যে সব মহামনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের শ্রেষ্ঠ ১২ জনের মধ্যে আল-কিন্দীর নাম কীর্তিত হতে পারে।*

আল-কিন্দীর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন ও এসব বিষয়ে বহুসংখ্যক পুস্তক রচনা করে গেছেন। তিনি ছিলেন মুসলিম দর্শনের 'ফালসাফা' শাখার জন্মদাতা। এই দার্শনিক গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র আল-কিন্দীই ছিলেন খাঁটি আরব। তাই তিনি 'আরবদের দার্শনিক' (ফায়লসুফুল আরাব) নামে খ্যাত।

আল-কিন্দীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল 'জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান-অন্বেষণ'। পার্থিব সম্পদ, খ্যাতি ও ভোগবিলাসকে তুচ্ছ করে তিনি মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাই তিনি দুনিয়ার ইতিহাসে অমর।

* টি, জে, দ্য বোআর — দ্যা হিষ্ট্রী অিব ফিলোজফী ইন ইসলাম।

আল-কিন্দীর পূর্ণ নাম ছিল আবু ইউসুফ য়া'কূব ইবন ইস্হাক আস্-সাব্বাহ ইবন ইমরান ইন ইসমাইল আল-আশ-আস ইবন কায়স আল-কিন্দী। তাঁর পিতা ইসহাক আস্-সাবাহ আরবের কিনদাহ গোত্রের কায়েস শাখার লোক ছিলেন। তাই দার্শনিক আবু ইউসুফ য়া'কূব ও কিন্দী নামে খ্যাত। কিন্দাহ্ গোত্রে ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবের একটি প্রধান গোত্রে ছিল ও আরবের অঞ্চল বিশেষে বহুদিন রাজত্বও করেছিল, সেই হিসেবে ইসহাক আস-সাব্বাহ্ কিন্দী রাজবংশের বলে দাবী করতেন।

আল-কিন্দীর দাদা (পিতামহ) আল-আশ আস রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে তিনি কয়েকজন সাহাবাহ্-এর সাথে কুফায় যেয়ে বসবাস করতে থাকেন। আল-কিন্দীর পিতা ইস্হাক আস্-সাব্বাহ্ বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফা আল্-মাহ্দী (৭৭৫ খ্রি. বা ১৫৮হি.-৭৮৫ খ্রি. বা ১৬৯ হি.), আলহাদী (৭৮৫ খ্রি. বা ১৬৯ হি.-৭৮৬ খ্রি. বা ১৭০ হি.) ও হারুনুর-রাশীদের (৭৮৬ খ্রি. বা ১৭০ হি.-৮০৯ খ্রি. বা ১৯৩ হি.) আমলে কুফার শাসনকর্তা ছিলেন। এই কুফায় য়া'কুব আল-কিন্দী জন্ম গ্রহণ করেন। আল-কিন্দীর জন্ম তারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে তিনি খলীফা হারুনুর-রাশীদের মৃত্যুর ১০ আগে জন্মগ্রহণ করেন। সেই হিসেবে তাঁর জন্ম তারিখ ৮০১ খ্রি. বা ১৮৫ হি.।

পিতা ইস্হাক আস্-সাব্বাহ্ পুত্র য়া'কুব আল-কিন্দীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। য়া'কুব আল-কিন্দী তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুসলিম ওলামা ও খ্রিষ্টান সুধীবৃন্দের কাছে শিক্ষালাভ করেন। অল্প কালের মধ্যেই তিনি কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন ও হাদীস, ফিকাহ্, ইতিহাস, দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব ও রাজনীতি প্রভৃতিতেও বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেন। সংগীতের প্রতিও তাঁর প্রচুর আকর্ষণ

ছিল এবং সংগীত বিদ্যায়ও তিনি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। বিভিন্ন ভাষাতেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। হিব্রু, ইরানী ও গ্রীক ভাষাতে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। কথিত আছে যে তিনি সংস্কৃত ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তবে দর্শন ও বিজ্ঞানের দিকেই আল-কিন্দীর বেশী আকর্ষণ ছিল।

অতি অল্প বয়সেই য়া'কুব আল-কিন্দীর প্রতিভা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খলীফা আলমামুন (৮১৩খ্রি. বা ১৯৭ হি. — ৮৩৩ খ্রি. বা ২১৮ হি.) আল-কিন্দীকে নিজের দরবারে স্থান দেন। আল-মামুন তাঁকে বিশেষভাবে আরিসতোতল ও অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকদের রচনা আরবিতে তরজমা করার কাজে নিয়োগ করেন। আল-কিন্দী বহুদিন এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কিছুকাল বাগদাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেন।

আল-কিন্দী খলীফা আল্-মু'তাসীমের (৮৩৩ খ্রি. বা ২১৮হি.-৮৪২ খ্রি. বা ২২৭ হি.) পুত্র আহমাদের গৃহশিক্ষক হিসেবেও কাজ করেন। আল-কিন্দীর কয়েকখানি পুস্তক তাঁর এই ছাত্রের জন্যই বিশেষভাবে রচিত। আল-কিন্দী খলীফা আল-মুতাওয়াককিলের (৮৪৭ খ্রি. বা ২৩২ হি.-৮৬১ খ্রি. বা ২৪৭ হি.) দরবারেও বেশ কিছুকাল সমাদর লাভ করেন। আল-কিন্দী তাঁর পরবর্তী জীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্ঞান সাধনায় ও গ্রন্থরচনায় অতিবাহিত করেন। জ্ঞান সাধনায় ব্যাপৃত অবস্থাতে দুনিয়ার এই শ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়। তাঁর মৃত্যুর তারিখ আনুমানিক ৮৭৩ খ্রি. বা ২৬০ হি.।

আল-কিন্দী বিভিন্ন বিষয়ে বহু পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর রচিত পুস্তকের সংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে তাঁর রচিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ২৭০। আল-কিন্দীর রচিত পুস্তকগুলির অধিকাংশই লুপ্ত হয়ে যায়। কয়েকখানি পুস্তকের

লাতিন তরজমা ছিল, কিন্তু আরবি মূল পুস্তকের কোনো পাত্তা ছিল না। 'পুস্তকের তালিকা' ও 'দার্শনিকদের ইতিহাস' জাতীয় পুস্তকের* মাধ্যমে আল-কিন্দীর রচিত পুস্তকের সংখ্যা নির্ণয় করার চেষ্টা হয়। সে জন্যই পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

তবে অধুনা আল-কিন্দীর কিছু কিছু পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। মিশর থেকে ড. আবু রিজা দুই খণ্ডে (প্রথম খণ্ড ১৯৫০ খ্রি., দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫৪ খ্রি.) আল-কিন্দীর কতকগুলি পুস্তকের আরবি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন। মিশরের ড. মাহমুদ আল-হিফ্নী ও প্রফেসর আহমদ আল-আহ্ ওয়ানী ও অধুনা আল-কিন্দীর আরও কয়েক খানা পুস্তকের সম্পাদনা ও তরজমা করেছেন। আল-কিন্দী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বহু পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইবনুন নাদীম ও আল-কিফতী তাঁর পুস্তকগুলিকে বিষয়বস্তু হিসেবে ১৭টি শ্রেণিতে বিভাগ করেছেন—

১. দশন
২. যুক্তিবিদ্যা
৩. গণিত
৪. ভূগোল
৫. সংগীত
৬. জ্যোতির্বিজ্ঞান (অ্যাসট্রোনমি)
৭. জ্যামিতি
৮. নভোমণ্ডল
৯. চিকিৎসাবিদ্যা
১০. ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় (অ্যাট্রোলজিক্যাল)

---

* এই জাতীয় পুস্তকগুলির মধ্যে ইবনুন নাদীমের 'ফিহ রিসত' ও আল-কিফতীর তায়ীখুল হুকামা প্রধান।